



ধর্মশিক্ষা কি জঙ্গি দমনে কার্যকর? না কি প্রয়োজন বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক মান

এ এন রাশেদা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল স্বৈরাচারী এরশাদ শাহীর শাসনামলে; মনে করা সংগত যে, মওলানা মাদ্রাসার পরামর্শে। রাজাকার শিরোমণি মওলানা মাদ্রাসা তখন শিক্ষক সমাজের নেতা- বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও এরশাদ শাহী সেই সংগঠনের চেয়ারম্যান। এ রকম হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা কারিকুলামে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে ধর্মশিক্ষা নবম ও দশম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় ছিল। এসএসসিতে লেটার মার্কস পাওয়ার উদ্দেশ্যে মানবিক শাখার অনেকেই ধর্মশিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করত। এভাবে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করার মধ্য দিয়ে মাদ্রাসা পাস সবারই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হলো। কিন্তু কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির কোন শিক্ষক নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সেই থেকে উপেক্ষিতই রইল। পরবর্তীতে আবার শিক্ষানীতিতে যখনই নৈতিক-শিক্ষা পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রস্তাব এসেছে তখনই এই গোষ্ঠী বাধা দিয়ে বলে এসেছে যে, ধর্ম-শিক্ষা পড়ালে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা প্রবেশ করানোর ছিল এ এক কৌশল। এর সমান্তরাল মাদ্রাসা ও কওমি শিক্ষা-ধারাতো রয়েছে। সে সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে নীতিশিক্ষার নামে ধর্মশিক্ষার অনুপ্রবেশ করানোর যুক্তি যে, কত নির্বোধের মতো ছিল- তা বর্তমান প্রজন্মের জঙ্গিপন্যার মাধ্যমে একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করা এবং বহু অসামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে। জঙ্গি উৎপাদনের উৎস হিসেবে মাদ্রাসা ধারাতো মূল নিয়ামকের ভূমিকায় আছে। এর কারণ বহুবিধ। পত্রপত্রিকা থেকেও জানা যায়। বিভিন্ন মাদ্রাসায় অপরাধ সংঘটিত হওয়া একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ২৪ জুলাই দৈনিক সংবাদের খবরে প্রকাশ 'যশোরের কেশবপুরে এসএমজি বরণডালি দাখিল মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর দুই ছাত্রীকে নিয়ে এলাকার এক জামায়াত নেতার বাড়িতে আটকিয়ে রেপ করেছে ওই মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর দুই ছাত্র। ওই দুই ছাত্রী যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বরণডালি গ্রামের জামায়াত নেতা ধনাঢ্য মফিজ গাজীর ছেলে ইব্রাহিম হোসেন ও একই গ্রামের অজগর ফকিরের ছেলে আমিনুর রহমান এসএমজি বরণডালি দাখিল উলুম দাখিল মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর ছাত্র।'- এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মাদ্রাসা ধারার শিক্ষা বা ইসলামের একমাত্র 'সাক্ষাৎ' মানুষ হিসেবে দাবিদারদের নৈতিকতার কোনো পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কি? হয়ত সবার ক্ষেত্রে তা সত্য না। তবে এ ধরনের বহু ঘটনা অনবরতই ঘটে চলেছে। এটি একটি নমুনা মাত্র।

আরো অনেক ঘটনা মাদ্রাসায় ঘটেছে যা স্বাভাবিক নীতি নৈতিকতার মূল্যকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখানোর সামিল। এছাড়াও আছে সুবিধা মতো ফতোয়া দিয়ে নারীকে পাথর ছুড়ে মারাসহ দোররা মারার বহু কাহিনী। বর্তমানে সালিশের নামে নারী ও শিশুদের গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে পেটানো, এমন কি শিশুদের গুহাঘারে পাইপ দিয়ে হাওয়া প্রবেশ করিয়ে হত্যা করা- নির্ধারনের

মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। স্কুলপড়ুয়া মেয়ে কর্তৃক মা-বাবা উভয়কেই হত্যা, কুকুর লেলিয়ে অমানবিক লোমহর্ষক হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। তাই পরিষ্কার করেই বলা যায়, প্রায় তিন যুগের বেশি সময় ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধর্মশিক্ষা তাদের কোনো নৈতিকতা বা মানবিকতাবোধের গুণাবলীতে স্বল্প করতে পারেনি। যুগে যুগে কোনো ধর্মই সমগ্র মানব সমাজের মাঝে তা সঞ্চারিত করতে পারেনি। নবীজীকেও ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে চুক্তি করতে হয়েছিল- যা মদীনা সনদ নামে খ্যাত। নবীজীর পরে খলিফাদের মধ্যে ৩ জনই মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন বা তাদের হত্যা করা হয়েছে; নবীজীর দৌহিত্রদের শিশুসহ হত্যা করা হয়েছে কারবালার প্রান্তরে এক ফোটা পানি পান করতে না-দিয়ে- সবই একা হয়েছিল ধর্মের নামে, আরও ভালো শাসন দেয়ার নামে, সত্য-পথের নামে, 'বিশুদ্ধ ইসলাম'-এর নামে, পরম সৃষ্টিকর্তার নামে।

কাজেই 'ইসলাম শান্তির ধর্ম'- বাণী দিয়ে হত্যাকাণ্ডের নিরস্ত্র করা যাবে না। কারণ 'ইসলামে জেহাদ ফরজ', 'মারো বা মরো'- এ নীতি ইসলামী ব্যাডিকেল প্রচারকদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে আসছে খারিজি, ইবনে তাইয়িয়াম তথা ইবনে ওয়াহাব নজনীর মাধ্যমে। দীর্ঘকাল ধরে তা সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের একটি বিশেষ অংশের মধ্যে পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছে। তাদেরই উত্তরাধিকার হলো মওদুদপন্থি জামায়েতে ইসলাম। তবে 'শান্তির ধর্ম' নামের- এই প্রচারণার ফলে নতুনদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে এ 'ভ্রান্ত পথে' না যাওয়ার জন্য। যদিও দু-পক্ষই একে অন্যের পথকে ভ্রান্ত বলেই চিহ্নিত করে যাচ্ছে এবং যাবে-দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত। আর সে জন্যই তো এত হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে। যারা 'শান্তির ধর্ম' বলছে তারা আবার 'ইহুদী নাসারা' বলে এক হাত নিচ্ছে এবং নারীর অধিকার ও কাদিয়ানীদের সম্পর্কেও পূর্বমত বহাল রাখছে।

এজন্য মুক্তির পথ- স্কুল কারিকুলামে একমাত্র ধর্মশিক্ষার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে হবার নয়। প্রয়োজন সেকুলার ও মানবিক শিক্ষা। নৈতিক শিক্ষা যেমন দিতে হবে- তেমনি সংবিধান অনুসারে এক ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাও দিতে হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ বিজ্ঞান- সব শিক্ষার্থীকেই পড়ানোর উপযোগী পাঠ্যক্রম সৃষ্টি করতে হবে। পাকিস্তানি শাসনামলেও স্কুলে তাই ছিল। ধর্মশিক্ষা স্কুলে একদিকে যেমন বিজ্ঞান তৈরি করে, অন্যদিকে অন্য ধর্মের শিক্ষক না-দিয়ে অসামান্য প্রতিষ্ঠা পায় স্কুল-শিক্ষার্থীদের মাঝে। তাই ধর্ম শিক্ষা দেয়া উচিত স্ব স্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে।

একটা সময় ছিল- যখন কেউ প্রুগ, কলরা বা বসন্তে আক্রান্ত হলে আপনজনরা ভয়ে তাদের ফেলে পালিয়ে যেত- ফলে গ্রামের পর গ্রাম শূন্য হয়ে যেত। আর সাধারণ মানুষ মনে করত- তা সৃষ্টিকর্তার অসন্তোষের ফল। সেখান থেকে বিজ্ঞানই পৃথিবীকে আজকের জায়গায় এনেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষকে এসব বিষয়ে অনেক মানবিক করেছে। আজ বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলেই আমাদের দেশ ফসলে সমৃদ্ধ হচ্ছে- নতুন নতুন ভ্যারাইটি উৎপন্ন হচ্ছে- মানুষ অজানা তথ্য জানতে পারছে, ডিএনএ আবিষ্কারের ফলে কত অসাধ্য কাজই না আজ মানুষের আয়ত্তে এসেছে।

আইসিটির ব্যবহার মানুষের কাজকে সহজ করে দিয়েছে- বাংলাদেশে তার চেউ লেগেছে। ফতোয়া দানকারীর কাছে এক সময় টিভি ছিল শয়তানের বাজ, নারী নেতৃত্ব ছিল হারাম- এমনকি ছবি তোলা, ঘরে ছবি রাখা হারাম। অথচ আজ হাজীরা যখন হজ করবেন তখন প্রত্যেক হাজী কি করছেন তার আত্মীয় স্বজনরা দেশে বসেই প্রত্যক্ষ করবেন। এখন, সেই ছবি তোলা এবং বিশ্বব্যাপী সে ছবি প্রদর্শন করা জায়েজ হলো কিভাবে? আবার টিভিতে ছবির সাহায্যেই তারা ধর্মের আলোচনা করছেন।

এক সময় 'সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে'- এই সত্য তত্ত্ব প্রচারের জন্য ধর্মগুরুরা জিওদানো ক্রনোকে আঙুনে পুড়িয়ে মেরেছে, গ্যালিলিওকে বন্দি করে রেখেছে- এমন হাজার হাজার উদাহরণ আছে কয়েক হাজার বছরের। বিজ্ঞান যদি কোপার্নিকাসের তত্ত্ব নিয়ে না অগ্রসর হতো- তাহলে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হতো না। আর হজে অগ্রহী ব্যক্তিদের প্রেনে চড়ে হজ করতে যাওয়া, ধু ধু মরুভূমির দেশে শস্য উৎপাদন, বনায়ন, ঘরে, বাসে, মসজিদে এয়ারকন্ডিশন- এতসব আরাম- আয়েশ কিভাবে হতো? এসবই তো বিজ্ঞানের অবদানে।

বিজ্ঞানের এতসব অবদানে কার ভূমিকা প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়? এ প্রশ্নের উত্তরজ্ঞ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জানানো খুবই জরুরি। বিজ্ঞান সব সময়ই চলমান জ্ঞান, প্রতিনিয়ত তার জ্ঞান প্রসারিত হয়, আগের জ্ঞান অনেক সময় বাতিলও হয়। কিন্তু ধর্ম তো তা না। ধর্মমতে- ধর্ম মানুষের সৃষ্টি না। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের সৃষ্টি। তাই ধর্মকে কখনো বিজ্ঞানের সমকক্ষ করে বিতর্ক করা সমীচীন না। ধর্ম মানুষের বিশ্বাস- তাকে আঘাত করাও ঠিক না। তবে তা নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ মত তো তৈরি হয়েই আছে- সেই আবির্ভাবের কাল থেকে। কিন্তু বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে অর্জিত জ্ঞান- বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উর্ধ্বে। বিজ্ঞানের থিউরি একটাই হয়; অনুমান-কল্প (Hypothesis) অনেক হতে পারে অনেকের দ্বারা। পরিশেষে সিদ্ধান্ত (Theory) একটাই। বিজ্ঞানীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নেই কোনো মার-মারি বা কাটা-কাটি। প্রমাণের বাইরে সে কোনো কথা বলে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গুলশানে ১৯ জন নিরীহ ব্যক্তি জঙ্গিদের হাতে নিহত না হলে সরকার বর্তমানের পদক্ষেপ কখনই নিত না। রুগাররা রুগে কি লিখেছে; তা অনুসন্ধানই ব্যস্ত থাকতো। তাই বর্তমানে জঙ্গিদের যে উত্থান হয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে ও 'ধনিক' শ্রেণীর সন্তানদের বাঁচাতে' মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধনী-গরিবের ব্যবধান কমিয়ে আনতেই হবে এবং সেই লক্ষ্যেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে। আর গড়তে হবে, বিজ্ঞান ধারার শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার, আর বাঙালির অসম্প্রদায়িক চেতনার ঐতিহ্যে, বাঙালির সংস্কৃতিতে ও পলিমাটির মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাবার চেতনায় সমৃদ্ধ করার, খোলা হাওয়ায় প্রকৃতি পরিবেশে খেলাধুলার মাধ্যমে বিকাশ ঘটাবার এর কোন বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যেই প্রয়োজন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সুখের বিষয়- ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে দেখা গেল মাদ্রাসা শিক্ষকদের

একাংশকে একধারার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দাবি জানানো।

উল্লেখ্য যে, প্রতিপক্ষকে হত্যা ও শাস্তি প্রদানের মতো অমানবিক আচরণ শুধু ইসলামের নামে নয়, একসময় বা এখনও কোথাও কোথাও ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও প্রকট ছিল। প্রথম যুগের খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের গ্রন্থ বাইবেলে ইহুদিদের বহু রচনা গ্রহণ করেছিল; যে-সব ছিল প্রচণ্ড অমানবিক, হিংস্রতা, ধর্মক্কা ও বর্বরতায় পরিপূর্ণ। তাই বলা হয় পুরাতন বাইবেলের প্রতি অন্ধবিশ্বাস- সভ্যতার যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে; তা ইতিহাসবিদদের শিহরিত করেছে। খ্রিস্টীয় ধর্মগুরু পোপ সেন্ট অগাস্টিন যার মৃত্যু হয় ৪১০ খ্রিস্টাব্দে; তিনি অত্যাচারের কঠিনতম এক অমানবিক নিয়মকানুন তৈরি করেছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যা ছিল নির্দেশিত। এভাবে 'বিশুদ্ধ-ধর্ম' বজায় রাখার স্বার্থের কাছে অন্যদের অধীনস্ত রাখার জন্য তারা ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রও কয়েক করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে যিনি ১১৯৮-১২১৬ সাল পর্যন্ত তৃতীয় পোপ ছিলেন- তিনি 'ধর্মদ্রোহীদের' খ্রিস্টীয় জগত থেকে চিরতরে বিদায় করার জন্য সুসংগঠিত আন্দোলনের পরিকল্পনাও করেছিলেন। এদের অত্যাচারের মাত্রা ও কাহিনী অনেক বীভৎস, ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘ। একইভাবে হিন্দু ধর্মের কাহিনীও হৃদয় বিদারক কম নয়। ধর্মগ্রন্থ শোনার অপরাধে শুদ্ধের কানে গরম সিনা ঢেলে দেয়া, কুমারী মেয়েকে জোর করে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়া এবং স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত আঙুনে নিক্ষেপ করে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে সহমরণে বাধ্য করা, ডাইনি আখ্যা দিয়েও জীবন্ত দগ্ধ করা (এখনও ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে সংগঠিত হতে দেখা যায়) এসবই অমানবিকতা ও পাশবিকতার স্বাক্ষর। বর্তমানে সেখান থেকে এইসব ধর্মাবলম্বীদের কেউ কেউ সরে এসেছেন।

ধর্ম বরাবরই বিজ্ঞান ও সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে। ইতিহাসই তার প্রমাণ। গবেষণা লব্ধ জ্ঞান 'সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের' কারণে চার গ্যালিলিওকে চার্চের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর ৩৫০ বছর পর পোপ দ্বিতীয় জন পল এ ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ভ্যাটিকান প্রমাণ করেছে যে, ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে গ্যালিলিওকে শাস্তি দেয়াটা তাদের ভুল ছিল। আর আনন্দের সংবাদ হলো- ২০১১-এর ১৪ এপ্রিল ভ্যাটিকান এই মহান বিজ্ঞানীর প্রতি আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তার গবেষণায় ব্যবহৃত টেলিস্কোপটি প্রদর্শনীর জন্য সবার সম্মুখে নিয়ে রেখেছেন। 'ঐ ঘটনা' থেকে আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত সব অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। প্রতিবাদ জানানোর সাহস ও যৌক্তিকতা অর্জনের জন্যই প্রয়োজন বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো; আর প্রয়োজন বিজ্ঞানের শিক্ষক তৈরিরও এক মহাপরিকল্পনার। বিজ্ঞান-চর্চা, বিজ্ঞান সাধনা, বিজ্ঞান মনস্কতা, যাবতীয় খেলাধুলার আবহ সুযোগ সৃষ্টি করা, আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন বেগবান করা ছাড়া জঙ্গি দমনে সফলতা অর্জন কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

[লেখক : সম্পাদক, শিক্ষাবর্তী ও সাবেক অধ্যাপক, নটর ডেম কলেজ]